রাতুল ঘোষ

পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রচ্ছদ : নিজস্ব নিবিড়তা

এই ২০১১ সালের কোন নিষ্প্রতিভ কবিতা-প্রয়াসী তরুণের যখন কৈশোর, তখন আমিও কিশোর ছিলাম। আমার কৈশোর ছিল বেমানান, ফাঁকা। মফস্বল থেকে কলকাতায় পড়তে আসা হস্টেলবালক যদি কখনও সুর বা ছন্দের দিকে আকৃষ্ট হয়ে ওঠে দুর্ভাগ্যবশত: জানবেন, সে একা। সে সময়ে আমার হাতে হঠাৎ ছিট্‌কে এসে পড়ে একটি দুটি কবিতার বই যেমন বন্দুকের গুলিতে খুলি ফেটে যাওয়া মানুষের সহ-মিছিলের লোকের গায়ে এসে লাগে আকস্মিক কিন্তু দুরভিসন্ধিময় রক্ত। সে এই এক দু ফোঁটা রক্তের আঘাত হয়তো পায় না, কিন্তু তার আমৃত্যু চেতনার দেয়ালে এই রক্তের গ্রাফিত্তি ফুটে ওঠে কোনরকম নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা না করেই। তেমনি এসেছিল একটি-দুটি কবিতার বই। তার মধ্যে দুটি বই-এর আঘাত খুব তীব্র। জীবনের চূড়ান্ততম রোম্যান্টিক সময়ে একটা অবুঝ আনন্দ-কল্পনা আকস্মিক আঘাতের মত এসে আমাদের বিহ্বল করে দেয়। একে বলা যেতে পারে কাব্যচেতনার প্রথম ভার্জিনিটি-স্খলন—তীব্র যন্ত্রণাও আনন্দের। তা এইসময়, দুটি বই দুজন নারীর রূপ নিয়ে এসে হঠাৎ আমার দিনরাত্তিরের শিরার মধ্যে একটা না-হওয়া দিন না-হওয়া রাত্তিরের আশ্চর্য গল্প সিরিঞ্জের মতো ফুঁড়ে ঢুকিয়ে দিল। আবার বলি, এটা 'আমার' নয়,'আমাদের কথা'। আমার যারা 'এখন' তাদের কথা।

সেই দুই বই বা দুজন নারী ছিল বনলতা সেন ও নীরা।

বনলতা সেনকে আপনারা দেখেছেন। হালকা সবুজ রঙের ঘাসের মতো একটা আশ্রয়ের ওপর বাদামী রেখায় স্তরে স্তরে শুকনো বাঁশপাতার মতো রেখাময় শিরাতন্তু দিয়ে বনলতা সেন নিজেকে প্রকাশ করানোর অধিকার দিয়েছিল সত্যজিৎ রায়কে। আমাদের প্রত্যেকের মস্তিষ্কের ভেতরে নরম ধরনের শীষের মত শব্দ এবং কথার ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলে এক নিজস্ব বনলতা সেন তাকিয়ে থাকে পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে; কিন্তু সে তাকানোর কোথাও না কোথাও সত্যজিতের বনলতার একটু ছোঁয়া থাকবেই। বনলতার গাল আর কপালের গাছের কাটা গুঁড়ির গোল বল্কলচিহ্নের মতো রেখসন্নিবেশ এই বনলতাকে অনেক, ঢের দূর শতাব্দীর মানুষী করে তুলেছে। এ মেয়েটি আমাকে, আমাদের কখনও না কখনও হয়তো আজও খুব শান্তভাবে ডেকে নেয়।

আর-একটি মেয়ে ছিল। আছে। ধারালো আগুনের মতো। সারাজীবন যার জন্য প্রতীক্ষা করা যায় আর সারাটা জীবনের প্রতীক্ষা, মাত্র তিনটি মিনিটের অলীক সমীকরণে এসে মিশে যায়—নীরা। নীরা অর্থাৎ—'বাসস্টপে তিন মিনিট অথচ তোমায় কাল স্বপ্নে বহুক্ষণ'। নীরা কখনও কলকাতা শহরের আমার মত চঞ্চল, কখনও মোমবাত্তির আলোর মত কেঁপে কেঁপে ওঠা কখনও শব্দের মধ্যে অশ্রুর মত কবিতা হয়ে নীরা লুকিয়ে থাকে। এবং

নীরা শ্বেতপাথরের মত শুদ্ধ ভালোবাসাময়—'এক হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ/আমি কি এই হাতে কোন পাপ করতে পারি?' সেই নীরার মুখ একটা সূর্যাস্তের মেঘের মত হঠাৎ করে আমি দেখতে পেয়েছিলাম 'হঠাৎ নীরা জন্য'—বই-এর আশ্চর্য প্রচ্ছদে। আগুনের মধ্যে শুকনো রক্তের রেখার আঁচড়ে নীরার একমাথা ঘূর্ণিঝড়ের মত চুল নীরার ঘুমন্ত চোখদুটির সম্মান রাখবে বলেই যেন অপরাজিতার লতার মতো কোমল হয়ে আছে। সমস্ত পুরোনো দুঃখ যেন প্রদীপের তলার অন্ধকারের মতো এলোপাথারি আঁচড়ে ঘিরে আছে নীরার চুলের পেছনে সমস্ত শূন্যতা। দুটি সহজ বন্ধ চোখের নীচে সামান্য ঠোঁট সমস্ত ডায়মেনশনের ধারণাকে অগ্রাহ্য করে যেন আপন খেয়ালে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছে। আর নীরার মুখের আকারটি একটি চাবির গর্তের মতো প্রতীক্ষা করছে চুম্বন দিয়ে সেই বন্ধ দরজা খোলা হবে বলে। এই ছিল নীরা। এই নীরা। এই নীরাই রয়ে যাবে। এই নীরাই সনীল গঙ্গোপাধ্যায় এর নীরা, আমার নীরা, আমাদের নীরা, পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষের নীরা কেবল একজন বাদে।

তাঁর নাম পূর্ণেন্দু পত্রী। তিনি কবিতা আঁকেন। এবং যখন আঁকেন তখন শুধু কবিতাকেই আঁকেন সকলের জন্য, তিনি কবিতা আঁকতে গিয়ে ভুলেও নিজের কথা বলেন না। কবিতার কথাই বলেন। এটাই প্রচ্ছদের ধর্ম। কবি পূর্ণেন্দু পত্রী আজীবন তুলি হতে এই নির্লিপ্ত নিবেদনের ধর্ম পালন করেছেন। তাঁর সমস্ত শিক্ষা-ক্ষমতাকে বজ্রকঠোর হাতে আত্মপ্রভাবের সূক্ষ্ম সম্মোহন থেকে বাঁচিয়ে শাসন করেছেন এবং ব্যবহার করেছেন। তাঁর আঁকা প্রচ্ছদগুলি তাই ঐ বিশেষ বইটির নান্দীমুখ বা মুখপত্র বা চিত্ররূপ হয়ে উঠেছে, পূর্ণেন্দুর ছবি হয়নি কখনোই। এজন্যই প্রচ্ছদশিল্পী পূর্ণেন্দু অমর। আর অবশ্যই তাঁর আকা প্রচ্ছদে এত বৈচিত্র্য, variation।

—এই আলোচনার সবটাই আমার এবং আমার মতো অনেকের কবিতা-মুখীন জীবনের একান্ততম অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত। কবিতা এবং ছবির প্রথম সোনালী স্পর্শের সঙ্গে পূর্ণেন্দু পত্রীর নাম রয়ে যাবে আমাদের জীবনে, আমার জীবনে। তাই এই লেখা ব্যক্তিগত তর্পনের মত, সেই মানুষটির উদ্দেশ্যে, যার নাম বাংলা বই-এর প্রচ্ছদ ও অলংকরণ শিল্পে চিরকালের সেরা শিল্পীদের মধ্যেই আসবে।

২

'...কালক্রমে তিনি হয়ে উঠেছেন এক প্রধান প্রচ্ছদশিল্পী। সত্যজিৎ রায়, খালেদ চৌধুরীর সঙ্গে একসঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে তাঁর নাম। ...সত্যজিৎ রায় বই হাতে নিয়েই বলতেন, এ কাভারটি তো পূর্ণেন্দুরই'।

—'পূর্ণেন্দু পত্রী'/জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়
(আকাদেমি পত্রিকা ১০, নভেম্বর ১৯৯৭)

পূর্ণেন্দু পত্রী ১৯৬০ সালে সিনেমা জগৎ পত্রিকায় সত্যজিৎ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন—'চিত্রকর সত্যজিৎকে না জেনে শুধু চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎকে জানা তাঁকে

সম্পূর্ণ জানা নয়'—তা তাঁর নিজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং হয়তো শিল্পী পূর্ণেন্দুর পরিচিতিই কবি পূর্ণেন্দু বা পরিচালক পূর্ণেন্দুর চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। 'গুরুত্বপূর্ণ' বলবার কারণ হল, বাংলা তথা ভারতীয় শিল্পে প্রচ্ছদশিল্পটি তার যথাযথ গুরুত্ব একটা সময় অবধি পায় নি। এমনকি সত্যজিতের রং তুলির অসাধারণত্ব যে একটি ভিন্নতর শিল্প সংবেদন এবং মর্যাদা দাবি করে, তা-ও আমরা দেরীতে উপলব্ধি করেছি। বিখ্যাত ও প্রতিভাবান বাঙালী কার্টুনিস্টদেরও একটা নগণ্যতার বোঝা বহন করে চলতে হয়েছে। তাই হয়তো পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রচ্ছদশিল্প নিয়ে আলোচনাটা খুব গুরুত্ব দাবী করে।

আধুনিক বাংলা প্রচ্ছদের এবং অলংকরণের আলোচনা সত্যজিৎ রায়ের প্রসঙ্গ ও তুলনা ছাড়া অসম্পূর্ণ। শ্রদ্ধেয় নন্দলাল বসু বা যামিনী রায়ের কাজ তাদের চিত্রকর পরিচয়েরই অঙ্গবিশেষ। তাই তাদের প্রসঙ্গ সরাসরি আনছি না এই সামান্য আলোচনায়।

প্রথমেই পূর্ব অধ্যায়ের 'বনলতা সেন' এবং 'নীরা' সংক্রান্ত আলোচনার প্রসঙ্গে একটি দুটি কথা বলা যাক। সত্যজিতের বনলতার ক্ষেত্রে একটা জিনিস খুব ভাইট্যাল—ব্যাকগ্রাউণ্ডে ভুট্টা বা জনারের পাতার মতো একটা নরম ক্ষেতের পরিবেশ সৃষ্টি এবং বনলতার মুখের সামনেও একটি দুটি পাতার নমনীয় বিস্তার। এই বিষয়টা যেন বনলতাকে ক্ষেতের মধ্যে ফুটে ওঠা ফসলের মতো মৃত্তিকাময়ী নারীতে পরিণত করেছে এবং তার ঘোমটা তাকে এনে দিয়েছে বাঙালী আদল। এখানেই সত্যজিতের নিজস্ব অনন্যতা। বনলতার মুখটি, মুখের আদলটি ব্যবহার করেছেন নিজস্ব চেতনার রঙে রাঙিয়ে। প্রসঙ্গত সত্যজিৎ কিন্তু ঘোমটা পরা বাঙালী মুখের ধারণাটিকে জীবনানন্দের কাব্যগ্রন্থ তথা কাব্যভাবনার ক্ষেত্রে বারবার ব্যবহার করেছেন। যেমন রূপসী বাংলার টাইটেলে বাঙালী নারীর যে ছোটো স্কেচটি ব্যবহার করেছেন, সেখানেও লাল পাড়ের ঘোমটার ভেতর দিয়ে একজন নারীর মুখের আদল।

কিন্তু ছবিটির সঙ্গে পূর্ণেন্দু পত্রীর নীরার তুলনা করলেই বোঝা যায়, (ছবি হিসাবে তুলনা নয়, ছবি থেকে প্রকাশিত চিত্রকরের প্রবণতার তুলনা) পূর্ণেন্দু খুব কম কথার শিল্পী বা বলা যায় কম আঁচড়ের শিল্পী (এই প্রসঙ্গটি পরে আরো বিস্তারিত হবে।) সত্যজিৎ তাঁর প্রতিটি প্রচ্ছদে ছবির জমিকে সম্পূর্ণ ভরাট করেছেন; কোথাও ফাঁকা রাখেননি, প্রয়োজনে শূন্যতাকেও ব্যবহার করেছেন। তাঁর ফেলুদা বা শঙ্কুর বা সন্দেশের প্রচ্ছদগুলি দেখলেই বোঝা যাবে, কিভাবে তিনি বইয়ের প্রথম পাতাটিকে ভরিয়ে তুলেছেন। অবশ্য একথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে ছোটদের বইয়ের প্রচ্ছদের বা রহস্য রোমাঞ্চ কাহিনীর প্রচ্ছদের মূল বক্তব্যটাই এটা, বিদেশী ক্রাইম বা অ্যাডভেঞ্চার নভেলগুলির প্রচ্ছদের সঙ্গে প্রতিতুলনা করলেও একথা বোঝে যাবে। আর তাই সত্যজিতের প্রচ্ছদে দেখি মুখ্যত কোনো একটি ঘটনার চিত্র বা কোনো চরিত্রের মুখ বা অবয়ব। কিন্তু পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রচ্ছদগুলি (এই প্রবন্ধে আমি মুখ্যত কবিতার বই এর প্রচ্ছদগুলিই আলোচনা করব) বই এর ভেতরের আধুনিক কবিতাগুলির সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলেছে ভীষণভাবে—প্রচ্ছদটিই সমগ্র বইটির নান্দীমুখ স্বরূপ একটি কবিতা হয়ে উঠেছে। আর সেখানে পূর্ণেন্দুর সুযোগও কম ছিল

ঘটনা বা চরিত্রকে রেখায়িত করবার, তাই তিনি আধুনিক আর্টের নানা ধারাকে বা বিবিধ অ্যাবস্ট্রাক্ট কর্ম কে ঐ বই-এর ভাববস্তুর সঙ্গে নিবিড় ভাবে গ্রথিত করলেন এবং প্রচ্ছদায়িত করলেন। আধুনিক প্রচ্ছদের ধর্মই এটা।

কিন্তু সত্যজিতের প্রচ্ছদ তথা অলংকরণের বিশাল সম্ভার থেকে পূর্ণেন্দু অবশ্যই কিছু শিল্পসামগ্রী গ্রহণ করেছেন এবং স্বীয় বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর করে সেগুলিকে ভিন্নতর ক্ষেত্রে সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়, সত্যজিতের জটিল ক্যালিগ্রাফির বিপুল ও বিস্ময়কর সম্ভার থেকে কিছু বিশেষ প্যাটার্ন গ্রহণ করে পূর্ণেন্দু কিভাবে সেগুলিকে গভীর ও গম্ভীর কবিতার বই এর প্রচ্ছদে ব্যবহার করেছেন। সত্যজিতের ক্যালিগ্রাফি, তার সঙ্গে বিভিন্ন লোগো এবং সিনেমার টাইটেল কার্ডের সূত্রে লেটারিং—এক বিশাল এবং বিচিত্র ভান্ডারবিশেষ। পূর্ণেন্দু পত্রীর কিছু অসাধারণ কাজে সত্যজিতের কিছু আশ্চর্য প্যাটার্নের পরিচয় মেলে। যেমন—শঙ্খ ঘোষের 'নিহিত পাতালছায়া' প্রচ্ছদটির কথা বলা যেতে পারে। খুব নিস্পৃহ একটা জলপাইরঙা সবুজের ওপর যেন একটা নীল রক্তের তীব্র ফোঁটা কবে থেকে জমে আছে, তার মধ্যে জমে আছে কবির অরক্ষিত বেদনা আর সেই নীলের মধ্যে মরা সবুজ দিয়ে চুলের মত সরু হরফে লেখা 'নিহিত পাতালছায়া'।

আর এই লেখাটির প্রতিটা অক্ষর পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত, কখনও সমরেখ—যেন নীল ব্যাকগ্রাউণ্ডের পাতালগহ্বর ফুঁড়ে প্রায় অদৃশ্য লেখাটি বেরিয়ে এসেছে ঘনসংলগ্ন অবস্থায়। অনন্য এই প্রচ্ছদটি সম্পূর্ণভাবেই পূর্ণেন্দুর স্বতন্ত্র শিল্পসৃষ্টি। কেবল সত্যজিতের 'জয় বাবা ফেলুনাথ' সিনেমার লোগোতে অক্ষরগুলি পরস্পর সংযুক্ততার অসামান্য প্যাটার্নটিকে যেন পূর্ণেন্দু অনেকটা নিজের মতো করে আলগোছে ব্যবহার করে এবং একটু রদবদল করে একটা নিজস্ব প্যাটার্নের জন্ম দিলেন।

বা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রেমের কবিতার (দে'জ) অপূর্ব সুন্দর প্রচ্ছদটি দেখা যাক। বেগুনী রঙের ঘন আঁচড়ের একটা ছায়া ছায়া মায়াবী ব্যাকগ্রাউণ্ডের ওপর সাদা রং দিয়ে মেঘের মতো করে 'প্রেমের কবিতা' লেখা এবং সে মেঘ যেন আরব্যরজনীর মেঘ। একটা মদির ভেসে যাওয়ার আমন্ত্রণ রয়েছে সে মেঘে।

এই লেখাটির সঙ্গে 'গ্যাংটকে গন্ডগোল' বা আরো বেশি করে 'ইচিংকা'-র সত্যজিৎ-কৃত ক্যালিগ্রাফিটির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। (অনেকটা একই প্যাটার্ন দেখা যায় 'প্রফেসর শঙ্কুর কান্ডকারখানা' বই এর প্রচ্ছদের লেখাটিতেও) পূর্ণেন্দু সেই প্যাটার্নকে নিয়ে আর একটু মোটা হরফ সৃষ্টি করলেন এবং কোমলভাবে তা ' প্রেমের কবিতা' লেখায় প্রযুক্ত করলেন। এখানেই তার অনন্যতা।

আবার সত্যজিতের ছবির রেখার প্যাটার্নের সঙ্গে একটি আশ্চর্য মিল দেখা যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুবাদ-পুস্তক 'অন্য দেশের কবিতা'র পূর্ণেন্দু পত্রী কৃত প্রচ্ছদে (অরুণা প্রকাশনী, মাঘ ১৩৭৩, প্রথম প্রকাশ) অসাধারণ সুন্দর এবং গতিময় এই প্রচ্ছদে পূর্ণেন্দুর গভীর কবিতা অনুধ্যানের স্বরূপটি বোঝা যায়, যেন তিনি বইটির চরিত্রটিকেই এক মলাটে প্রকাশ করেছেন। ধূসর (অফ-হোয়াইট) ব্যাকগ্রাউণ্ডের ওপরে কালো একটি

হ্যান্ডমেড এবড়ো খেবড়ো ভাবে হাতে ছেঁড়ার এফেক্ট এবং তার ওপরে সবুজ রঙের রেখার আলপনায় একটা দূর দেশের সমুদ্রতীরের পাখি কবিতার সুদূর কিন্তু চিরন্তন সংকেত বহন করছে। একটির পর একটি রেখার প্যাঁচালো প্যাটার্নটির সঙ্গে সত্যজিৎ-কৃত বনলতা সেনের মুখের রেখাময়তার একটা অদ্ভুত মিল চোখে পড়ে। দুটিতেই গাছের বল্কলরেখার মতো একের পর এক রেখা সাজিয়ে ভরাট করা হয়েছে এবং দুটি প্রচ্ছদই অনন্য। পূর্ণেন্দু পত্রীর এই প্রচ্ছদটি অনবদ্যতায় হয়তো সত্যজিৎকেও ছাপিয়ে গেছে।

পূর্ণেন্দু পত্রীর আর একটি বিশিষ্টতাও লক্ষণীয়, তা হল প্রচ্ছদের মিতভাষিতা। পূর্ণেন্দুর সুর কখনোই চড়া নয়, অমিতভাষী এবং মৃদুভাষী কিন্তু অসাধারণভাবে যথার্থভাষী। অনেক সময়েই পূর্ণেন্দু কেবল বইটির নাম একটি বিশেষ রঙের ব্যাকগ্রাউণ্ডের ওপরে কোনো বিশিষ্ট প্যাটার্নে ফুটিয়ে তুলেছেন, আর সেইটুকুতেই বইটির গভীরতা এবং নিজস্ব দাবী ফুটে বেরিয়েছে। যেমন বুদ্ধদেব বসুর কবিতা সংগ্রহের (দে'জ) প্রচ্ছদে কেবল একটি ছাইরঙের ব্যাকগ্রাউণ্ডের ওপর সাদা কালি দিয়ে একটি বিশেষ প্যাটার্নে 'বুদ্ধদেব বসু'। ঠিক একই জিনিস আমরা লক্ষ্য করি অমিয় চক্রবর্তীর 'কবিতা সংগ্রহের সত্যজিৎ রায়-কৃত প্রচ্ছদে। ব্যাকগ্রাউণ্ডের রং-ও প্রায় এক, কেবল লেখার প্যাটার্নটা আলাদা এবং প্রচ্ছদের নিম্নাংশে অমিয় চক্রবর্তীর সাক্ষর। উল্লেখ্য দুটি সংকলন গ্রন্থেরই সম্পাদক নরেশ গুহ। আশা করা যায়, পূর্ণেন্দু পত্রীর সত্যজিৎ-সংলগ্নতার একটা সাধারণ ধারণা এটুকুতে দেওয়া গেল।

৩

প্রসঙ্গত, পূর্ণেন্দু পত্রীর বইয়ে ছবি ছাড়া কেবল লেখার প্যাটার্নেরও আদল পাই। যেমন, উৎপল কুমার বসুর কবিতা সংগ্রহ (দে'জ) তে বর্ষার জলরঙা মেঘের ব্যাকগ্রাউণ্ডের ওপর সহজ সুন্দর করে লেখা 'কবিতা সংগ্রহ' ও তার তলায় 'উৎপলকুমার বসু'— যেন পাণ্ডুলিপির আয়োজন। এক্ষেত্রে কথারম্ভে উৎপলকুমার বসুর ভূমিকার প্রথম দুটি লাইন খুবই প্রণিধানযোগ্য—'যে সামান্য কবিখ্যাতিটুকু আমার আছে তার অন্যতম কারণ হয়ত এই যে আমার বইগুলি দুষ্প্রাপ্য। এমনকি আমার নিজের কাছেও কোন কোন বইয়ের কপি নেই।' এবার ঐ পাণ্ডুলিপির আয়োজনের অনন্যতা হয়তো পরিস্ফুট হল।

পূর্ণেন্দু পত্রীর অলংকৃত দুটি একটি গদ্যপুস্তকের প্রচ্ছদের কথাও এই ফাঁকে উল্লেখ করা যেতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথ রায় রচিত 'শিল্প সাহিত্য দেশ কাল' (দে'জ) প্রবন্ধ সংকলনটির প্রচ্ছদেও ছাই রঙের ব্যাকগ্রাউণ্ডের ওপর সবুজ এবং কালো রঙের একটা মোটা প্যাটার্নে একের পর এক লেখা 'শিল্প/সাহিত্য/দেশ/কাল' এবং প্রতিটিরই শেষে দীর্ঘায়িত মাত্রা প্রমাণ করছে প্রতিটি বিষয়ই চলমান তথা গতিশীল এবং অবশ্যই পরিবর্তনশীল। প্রবন্ধগ্রন্থের প্রচ্ছদ হিসাবে এর চেয়ে যোগ্য আর কি-ই বা হতে পারে?

আবার রাম হালদার রচিত 'কথকতা কমলালয় ও প্রসঙ্গ ফিল্ম সোসাইটি' (অনুষ্টুপ) গ্রন্থটির প্রচ্ছদেও একটি কথাই পর পর ওপর নীচে লেখা সবুজ ব্যাকগ্রাউণ্ডের ওপর।

কেবল 'কথকতা', 'কমলালয়' এবং 'প্রসঙ্গ' শব্দটিকে সাদা রং দিয়ে একটি মোটা ক্যালিগ্রাফিতে লিখেছেন পূর্ণেন্দু। প্রচ্ছদে একটা আলাপচারিতা বা প্রসন্ন গদ্যের আভাস মেলে খুব স্বতস্ফূর্তভাবে।

আবার আবু সয়ীদ আইয়ুবের 'পথের শেষ কোথায়' প্রবন্ধটিতে লাল কালিতে লেখা 'পথের শেষ কোথায়' কথাটির সঙ্গেই আকাশী একটা ছায়ার মত অক্ষরশরীরকে পেছনে দাঁড় করিয়েছেন পূর্ণেন্দু এবং লেখকের সুদূর যাত্রার একটা ইঙ্গিত দিচ্ছেন।

তবে প্রবন্ধগুলিতে যে কেবলই ক্যালিগ্রাফিক প্যাটার্ন ব্যবহৃত হয়েছে তা নয়। চিত্রিত প্রচ্ছদ-ও রয়েছে। যেমন শঙ্খ ঘোষের 'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক' গ্রন্থের প্রচ্ছদটি। কালো এবং খয়েরি রঙের দুটি তোরণের ভেতর আর একটি কালো দরজাসুলভ ব্যাকগ্রাউণ্ডের ওপর একতারা হাতে কবি বাউলের উদাত্ত প্রতিচ্ছবি। 'কালের মাত্রা' কথাটিও দ্বিতীয় তোরণের খয়েরি রঙে রাঙানো, বাকি কথাগুলো কালোতে। পূর্ণেন্দু একটা গতি এবং সেই গতির নির্দিষ্ট অভিমুখকে যেমন দেখিয়েছেন; তেমনি স্তরে স্তরে তোরণের মত আকার নাট্যমঞ্চের একের পর এক পর্দার স্পেসকে ব্যঞ্জিত করেছে।

আবার আবু সয়ীদ আইয়ুবেরই 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের এপ্রিল ২০০৩ দেজ সংস্করণের প্রচ্ছদটি দেখুন। সেখানে ঘন সবুজ ব্যাকগ্রাউণ্ডে কালো রেখার কন্টকময় আঁচড়ে আঁচড়ে একটি চোখের আদল ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যে চোখ আবার তিনটি স্তরে প্রকাশিত। প্রাবন্ধিকের গভীর ও বহুস্তরিক তথা দূরদর্শী চিন্তাভাবনার আগাম সংকেত যেমন দিচ্ছে এই চোখ, তেমনি আবার ঘনসবুজের মধ্যে অনতিস্পষ্ট ঘন কালো স্কেচ বিষয়টির গভীরতা এবং ঘনত্বকেই যেন নির্দেশ করে।

একটা কথা মনে হল, বলে রাখা প্রয়োজন। আমরা প্রচ্ছদের যে এই ব্যাঙ্গার্থগুলি আবিষ্কার করার চেষ্টা করছি; এগুলি কিন্তু সাধারণভাবে পাঠকের চোখে আলাদা করে পড়ার কথা নয়, পড়েওনা। কিন্তু প্রচ্ছদটির সার্থকতা তখনই যখন তা না বোঝা সত্ত্বেও (বোঝা অর্থে বিশ্লেষণাত্মক বিচার ও অর্থগ্রহণ বলতে চাইছি) পাঠকের চেতনায় খুব অজান্তেই একটা প্রভাব, বলা যেতে পারে 'ভিসুয়াল ইমপ্যাক্ট' বিস্তার করে। আমরা কেবল সেই প্রভাবটিকে বিশ্লেষণ করে দেখতে চাইছি, কি কি ভাবে প্রভাবটা পড়লো এবং এর পেছনে চিত্রকর কিভাবে নিজের শিল্পক্ষমতাকে নিযুক্ত করেছেন। কারণ সেখানেই শিল্পীর রহস্য এবং দক্ষতাবিচারের চাবিকাঠি লুকিয়ে রয়েছে। অন্তত: আধুনিক শিল্পের ক্ষেত্রে।

আর দুটি অসাধারণ গদ্য-পুস্তকের প্রচ্ছদের কথা বলে কবিতার রাজ্যে প্রবেশ করব। তার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে 'রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য' (আনন্দ, প্রথম সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, অক্টোবর ১৯৮২) নামে গৌরকিশোর ঘোষের ব্যঙ্গনিপুণ সময়চিত্রের, যাকে 'সংবাদভাষ্য'-ও বলা যায়, তার একটি অনন্য সংকলনের প্রচ্ছদ। বেগুনী রঙের ব্যাকগ্রাউণ্ডের ওপর একটি সাদা দৃঢ়মুষ্ঠি তার তর্জনী উত্তোলিত করে আছে এবং সে তর্জনীটি একটি কলমের নিব। চিরপ্রতিবাদী নির্ভীক সত্যসন্ধ সাংবাদিকের কলমের খোঁচার সাংঘাতিক জোরের

কথা প্রকাশক-ও বইয়ের মুখবন্ধে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং এও বলেছেন—'রাজনৈতিক ব্যঙ্গ যে ভবিষ্যদ্বানীর পর্যায়ে পড়তে পারে, রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য না পড়লে তা জানা যেত না।' এবং এটুকু পড়ার পরই প্রচ্ছদের তর্জনীনির্দেশ হঠাৎ কখন যেন লেখকের তর্জনীনির্দেশ হয়ে গিয়ে রাজনৈতিক দুনিয়ার বিধাতার তর্জনীনির্দেশক রূপায়িত করতে থাকে। এভাবেই প্রচ্ছদটি সার্থক হয়ে ওঠে। আর একটি বই হল নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বিখ্যাত 'কবিতার ক্লাস'। কবিতা এবং ছন্দকে সহজে এবং প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়েছেন এই লিরিক কবি-মাস্টারমশাই। যাঁর বিখ্যাত 'ছাত্রদের মধ্যে সর্বাজনগ্রাহ্য ছিলেন জিজ্ঞাসু পড়ুয়া শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন। বইটির প্রচ্ছদ-ও বইটির মতোই সাদাসিধে। কিন্তু তার মধ্যেও অসাধারণ ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী। সাদা সাদা পরস্পরছেদী জালের মত রেখা যেন হাসপাতালের বড়ো বড়ো ব্যাণ্ডেজ বা গজ কাপড়ের টুকরো টুকরো করে কাটা বর্গক্ষেত্র তৈরী করেছে এখানে। তার ওপরে আবার একইভাবে বৃত্ত, চতুর্ভুজ ইত্যাদি জ্যামিতিক আকার দেওয়া, চতুর্ভূজগুলি পরস্পরছেদী রেখা বা ক্রিস-ক্রস দিয়ে সবটাই ভরাট, বৃত্তগুলির অর্ধাংশ সেভাবে ভরাট;আর এলোপাথারি এই জ্যামিতিক আকৃতিগুলোর মধ্যে একটি বিশিষ্ট আকৃতি-অর্ধচন্দ্রাকৃতি, যেন একটি মানুষের মাথা দুটি হাত তুলে আছে, বা একটি প্রদীপ বা হয়তো কিছুই নয়। কিন্তু ঐ কিছুই নয়-টিই সমগ্র ছবিটিতে একটা প্রাণের ব্যঞ্জনা আনছে। ছন্দ-মিল এসব প্রক্রিয়াগত শিক্ষা বা 'টেকনিক্যাল' বিষয়ের মধ্যে কাব্যগুণের আভাস আনছে ঐ ফর্মটি। আবার পুরো ছবিটিতে বোর্ডের ওপর চক পেন্সিল আঁকার ইমপ্যাক্ট-ও এসেছে। বিশিষ্ট জ্যামিতিক ক্ষেত্রগুলি একটা নির্দিষ্ট নিয়মের পুনরাবৃত্তি বা আবর্তনকেই যেন অদ্ভুতভাবে বুঝিয়েছে। আর জ্যামিতিক চিত্রগুলি এলোপাথারিভাবে বসানো, যেন প্রমাণ করছে কোথাও কোথাও কবিতা হয়ে উঠেছে, কোথাও কোথাও হয়ে ওঠেনি। ...সব মিলিয়ে সমগ্র প্রচ্ছদটি অসামান্য আপাত সুন্দর কিন্তু সুগভীর এবং শীলিত এক অভিব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে পাঠককে স্বাগত জানাচ্ছে কবিতার ক্লাসে।

এভাবে আরো গদ্যরচনায় 'পত্রীমশাই' নিজের অসামান্য প্রতিভার জাদুস্পর্শ ছুঁইয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর নিজস্ব বিপ্লব, ছবির বিপ্লব বই থেকে বইতে সঞ্চারিত হয়েছে, বই থেকে মানুষে সঞ্চারিত হয়েছে মানুষ থেকে সঞ্চারিত হয়েছে প্রজন্মে।

৪

কবিতার বই-এর প্রচ্ছদের ক্ষেত্রে পূর্ণেন্দুর যে একটি নিজস্ব ঘরানা ছিলো, তা নতুন করে বলবার বা প্রমাণ করবার মতো কথা নয়। বলবার বা বিস্মিত হবার বিষয়টা হলো সেই ঘরানার ব্যপ্তি। এত রকমের আঙ্গিক সেই ঘরানায় লুকিয়ে আছে যে তা তৈরি করেছে প্রচ্ছদশিল্পের নিজস্ব জগৎ। পূর্ণেন্দুর প্রচ্ছদে সাধারণত কোলাজ থাকত না, থাকে তুলি এবং কলমের অলৌকিক প্রলেপ। কলমের প্রলেপ তথা আঁচড়ের কথায় মনে পড়ে যায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'উলঙ্গ রাজা' কাব্যগ্রন্থের অসাধারণ প্রচ্ছদটির কথা। সম্পূর্ণ কালো

ব্যাক-গ্রাউণ্ডের ওপর সাদা কালির আঁচড়ে ফুটে ওঠা একটা বিকৃত দেহাবয়ব বা ফিগার, যার সমগ্র শরীরটি হয়তো ক্যাকটাস গাছের কণ্টকময়তায় আচ্ছন্ন। মানুষটির অন্তঃসারশূন্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার একটি আভাস ফুটে উঠেছে এবং ফুটে উঠেছে মানুষটার পেছনের অন্ধকার শূন্যতার কথা। ক্যাকটাস কাঁটার পোশাক যেমন তার দেহের সত্যিকার বর্ণ বা আকারকে ঢাকতে পারে না; তেমনি এই রাজা তার নগ্নতাকে পোশাক মনে করে দাঁড়িয়ে আছে নির্লজ্জ স্তাবতকতার অন্ধকারে। আরো গভীরভাবে প্রচ্ছদটিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রচ্ছদে মানুষটির অবয়বের মধ্যেই কাঁটার অক্ষরে 'উলঙ্গ রাজা' কথাটি লেখা রয়েছে। মানুষটির সমগ্র অস্তিত্ব এবং অ্যাপিয়ারেন্স'—এর মধ্যেই তার নগ্নতার সিলমোহর মুদ্রিত। প্রচ্ছদটির বাঁদিকে উপরে লম্বালম্বি ভাবে ভরাট হরফে 'উলঙ্গ রাজা। নীরেন্দ্রনাথ চক্রর্বতী' লেখা। একটি সম্পূর্ণ কমপ্যাক্ট প্রচ্ছদ।

প্রচ্ছদের ক্ষেত্রে এই 'কমপ্যাক্ট' ব্যাপারটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত আমরা সত্যজিতের প্রচ্ছদ এবং অলঙ্করণে দেখতে পাই। কিন্তু সত্যজিতের প্রচ্ছদ, যা মূলত ছোটদের বই-এর সেখানে কিন্তু আধুনিক চিত্রশৈলীর অনুপ্রবেশের কোন জায়গা ছিল না। চরিত্রগুলি এবং গল্পটির বিশেষ কোন মুহূর্তের ছবিটি আকর্ষক ভাবে অঙ্কিত করাই ছিলো প্রচ্ছদটির মূল উদ্দেশ্য। সন্দেশ পত্রিকার প্রচ্ছদেও দেখি 'সন্দেশ' লেখাটিকে নানা চিত্তাকর্ষক এবং মনোহারী প্যাটার্নে এনে তার সঙ্গে সঙ্গে প্রাসঙ্গিক একটি চিত্র-প্রেক্ষিত তৈরি করেই সত্যজিৎ অসাধারণ পরিপূর্ণ প্রচ্ছদ তৈরি করেছেন। কিন্তু পূর্ণেন্দুর কৃতিত্ব এখানেই যে তিনি চূড়ান্ত আধুনিক এবং জটিল, পাগল সমস্ত কবিতার বই-এর প্রচ্ছদ করতে গিয়ে সামগ্রিক গ্রন্থভাবনাটিকে আধুনিক আঙ্গিকে প্রকাশ করেছেন। চিত্রের সাহায্য নিয়েছেন। তবু তারই মধ্যে চিত্রটিকে প্রচ্ছদপৃষ্ঠার মধ্যে কাব্যগ্রন্থ ও কবির নাম সমেত পরিপূর্ণভাবে স্থাপিত করেছেন। দেখা যাক শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রভু নষ্ট হয়ে যাই' কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদটি। একটু কমলা রঙের আভা ছোঁয়ানো হলুদ ব্যাকগ্রাউন্ডের ওপর কালো একজন পতনশীল তাসের মানুষ, যার সর্বশরীরে ছিদ্র। যেন ঘুন ধরা। গ্রন্থনামও পূর্ণেন্দু পত্রীরই দেওয়া, কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতাটির অনুসরণে কি আছে সেই কবিতায়?—

বার বার নষ্ট হয়ে যাই
প্রভু, তুমি আমাকে পবিত্র
করো, যাতে লোকে খাঁচাটাই
কেনে, প্রভু নষ্ট হয়ে যাই
বারবার নষ্ট হয়ে যাই
একবার আমাকে পবিত্র
করো প্রভু, যদি বাঁচাটাই
মুখ্য, প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই!

পূর্ণেন্দু খাঁচাটি আঁকলেন, শতছিদ্র খাঁচা, হাত-পায়ের জোড়গুলো যেন কাগজের মতো কেউ কেটে দিয়েছে। মানুষটি পড়ছে। দুহাতের ভাষায় আর্তি। কিন্তু মুখে কি?

ধোঁয়ার মতো বেরুচ্ছে যেন! সিগারেট! শক্তি! মানুষটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ঠোঁটে লেগে আছে বিদ্রুপের মতো স্বেচ্ছাচার! কবিতাটির মধ্যেও সেই ব্যঙ্গ পরিষ্কার—'প্রভু, তুমি আমাকে পবিত্র/করো যাতে লোকে খাঁচাটাই/কেনে, প্রভু নষ্ট হয়ে যাই' বা 'একবার আমাকে পবিত্র/করো প্রভু, যদি বাঁচাটাই/মুখ্য,...'। —এই ছবিটি সমগ্র প্রচ্ছদের বাঁ দিকে, ডানদিকের স্পেসে আবার তাসের খাঁজ যেন হরফে—'প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই'। ডানদিকে একদম ওপরে ছোট হরফে লেখা কবির নাম। অসাধারণ একটি পরিপূর্ণ প্রচ্ছদ!

বা ধরা যাক শঙ্খ ঘোষের 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ' কাব্য গ্রন্থটির প্রচ্ছদের কথা। একটা বেগুনি ছায়াময় ছিন্ন পর্দার মতো অর্ধধূসর ব্যাকগ্রাউন্ড, যেন আমাদের রক্তের ভেতরে সূর্যাস্ত হচ্ছে। আর সেই সূর্যাস্তের রক্তনদীর মধ্যে তিনটি সাদা পাঁজরের নৌকো। হাড়ের কাঠামো। রক্তে জল ছলছল করে। কাব্যগ্রন্থটির নামটি লেখা কালো রঙে, রুক্ষ কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দধীচির মতো—যাত্রাপথের ফলক হয়ে আছে।

এই রকম আশ্চর্য একটা প্রচ্ছদ দেখি অধুনা প্রায় দুষ্প্রাপ্য একটি কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদে—মানস রায়চৌধুরীর 'অনিদ্র গোলাপ'। ১৯৬২ সালের বই। এই বইটির প্রচ্ছদের কথা 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ'—এর পর উল্লেখ করলাম, কারণ, এই প্রচ্ছদেও ব্যাকগ্রাউন্ড একটা বড়ো ভূমিকা নিয়েছে। কাব্যগ্রন্থটি প্রেম ও বিষণ্ণতার। যন্ত্রণার। অসাধারণ কিছু পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না—'তুমি চলে গেলে/এই মূঢ় নগ্ন আঁধারের ভার/এখন বইতে হবে আমাকেই। নিঃসঙ্গতা তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার/করাতে দ্বিখণ্ড করতে আমার বিশ্রাম/থাকবে বিছানা ছেয়ে স্বপ্নহীন অনিদ্রার ঘাম।' —এটিই কাব্যগ্রন্থের মূল সুর। পূর্ণেন্দু কালো আর ঘন গোলাপী (যা গোলাপের রং, বিশুদ্ধ গাঢ় গোলাপের রং) আঁচড়ে আঁচড়ে একটা অন্ধকার রক্তাক্ত জাগরণের ছবি আঁকলেন। গোলাপের ভিতরের অন্ধকার যেন হৃৎপিণ্ডের নিঃস্ব অন্ধকারের শূন্যতায় মিশে গেল। আর এই অন্ধকার যবনিকার ডানদিকে এবং ওপরে একটু অংশ ছিঁড়ে বার করে আনা সাদা রং-এর ওপরে লেখা কবির নাম এবং একটি গোলাপের চিত্রসমেত কবিতার বইটির নাম। এলোপাথারি, নেশাতুর বা অন্যমনস্ক হরফে। প্রচ্ছদটি দেখলেই বইটির একটা কবিতার কথা মনে পড়ে যায় নাম—'সন্তানের শোকে'—

ইচ্ছামত যে ফুলটা তুলে আনলে আজ
সেটা যে আমার হৃৎপিণ্ড
ফুটিয়েছিলাম তার অনিদ্র পাপড়িতে
জীবনের আকাঙ্ক্ষার সূক্ষ্ম কারুকাজ।...
...বরং সাজাও হেসে তোমার ঐ শৌখিন ফুলদানি
রক্তমুখী কুসুম স্তবকে
আমি তো প্রচ্ছন্ন, কিন্তু ভাসছে হাহাকার...
—অন্ধকার ফুলে উঠল প্রিয়তম সন্তানের শোকে।

এইরকমই একটি শক্তিশালী প্রচ্ছদ তিনি এঁকেছেন শঙ্খ ঘোষ-এর 'বাবরের প্রার্থনা' বইতে। হলুদ ব্যাকগ্রাউণ্ড—এর ওপর কালো কালির আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলা দুটি হাত, দুটি ঊর্ধ্বমুখী হাত, যারা অন্ধকারকে ভেদ করে ছুঁতে চাইছে ঈপ্সিত সত্যকে। কিন্তু অন্ধকার যে দুটি হাতের মধ্যেও রেখাজাল ছড়িয়েছে। তাই প্রার্থনা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই অসহায়ের।

একই রকম প্রতীকী প্রচ্ছদ মেলে শঙ্খ ঘোষের 'দিনগুলি রাতগুলি' পড়তে গিয়েও। প্রচ্ছদের উপরের এক তৃতীয়াংশ হলদে এবং নীচের দুই তৃতীয়াংশ হালকা গেরুয়া ব্যাকগ্রাউণ্ডের ওপর দুই ভাগে কালো ফিতার মতো প্রবাহচিহ্ন এঁকে দিয়েছেন পূর্ণেন্দু পত্রী। দিনগুলিও তীব্র উজ্জ্বল নয় রাতগুলিও নিকষ অন্ধকার নয়;কিন্তু সবকিছুকে অতিক্রম করে ঐ প্রবাহ, জীবনপ্রবাহের স্বতস্ফূর্ত ধ্রুব চলন নিয়ে সত্য হয়ে আছে।

কিংবা ধরা যাক বিষ্ণু দে'র 'আমার হৃদয়ে বাঁচো' গ্রন্থটির প্রচ্ছদের কথা। কালো ব্যাকগ্রাউন্ডের ওপর সাদা কালির আঁচড়ে আঁচড়ে ফুটে উঠেছে প্রচ্ছদ। বইটির নাম 'আমার হৃদয়ে বাঁচো।' কিন্তু প্রচ্ছদটির রহস্য লুকিয়ে আছে বইটির নাম-কবিতা পাঠের মধ্যে, যার শিরোনাম—'আমার হৃদয়ে বাঁচো মননে স্নায়ুতে।' তাই পূর্ণেন্দু আঁকলেন, বা বলা ভালো, সাদা আঁচড়ের সীমানা দিয়ে তৈরি করলেন এক মানুষের অবয়ব। আর সেই অবয়বের ভেতরের অন্ধকার ভরিয়ে দিলেন সাদা ও মেঘলা ফুলের পূর্ণতায়। কবি উক্ত কবিতায় বলেছিলেন—

তুমি তো জানোনা তুমি আজীবন সুদীর্ঘ আয়ুতে
আমার হৃদয়ে বাঁচো মননে স্নায়ুতে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'ছেলে গেছে বনে' বইটির প্রচ্ছদটি অদ্ভুত। একটি জালিকাময় শীর্ণ পাতার আনুবীক্ষণিক চিত্র এঁকেছেন পূর্ণেন্দু। কিন্তু সম্পূর্ণ ছবিটি তিনি পাতার সবুজ ব্যাকগ্রাউণ্ডের ওপর এঁকেছেন। ফলে, পাতার মোটা জালিকাগুলি হয়ে গেছে সবুজ অরণ্যের মধ্যে দাঁড়ানো হলের কাচ, আর সরু জালিকাগুলি নিষ্পত্র শাখা প্রশাখা। কোনো পাতা নেই, কিন্তু অরণ্য আশ্রয়ের মতো সবুজ হয়ে আছে। কারণ, 'ছেলে গেছে বনে'।

প্রথমে যে কমপ্যাক্ট বা পরিপূর্ণ বা বলা ভালো ঘনপিনদ্ধ প্রচ্ছদ-এর কথা বলছিলাম পূর্ণেন্দুর আঁকায় : তা কিন্তু সবসময় রঙ বা রেখার বিস্তৃতির ক্ষেত্রের ওপর নির্ভর করে না। অঙ্কিত ছবি বা 'এফেক্ট'-এর একটা অদ্ভুত মায়া সমগ্র প্রচ্ছদটিকে ছেয়ে থাকে। যেমন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর 'আমার স্বপ্ন' বইটির প্রচ্ছদে পূর্ণেন্দু দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে একটি ছবি এঁকেছেন। বহুরেখাময় স্বপ্নের ভেতরে মেঘের মতো আঁকাবাঁকা সবজু হলদু রঙের যৌবন ঋদ্ধ সম্ভাবনা। অনেকটা ডিম্বাকার এই ছবিটার ওপরের সাদা স্পেসে সেরকমই ভরাট এবং ম্যাজিকাল হরফে লেখা বইটির নাম এবং তার পাশে লেখকের নাম। বইটি হাতে নিলে বোঝা যায় অনেকটা জায়গা সাদা রয়েছে, কিন্তু কোথাও কোন ফাঁকা নেই। ফাঁকা না থাকার কারণ হল ঐ শাদা-কালো রেখাময়তার মধ্যে হঠাৎ ভাঁজে ভাঁজে সবুজ

এবং হলুদ রঙের ব্যবহারে উজ্জ্বল বসন্ত দিনের আমন্ত্রণ

আবার বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদে বোদলেয়র এবং রিলকের কবিতার প্রচ্ছপট আঁকতে গিয়ে পূর্ণেন্দু দুই কবিরই মুখের একটা রেখাময় চিত্র আঁকলেন। তার ওপরে বই দুটির নাম লেখা। লেখক দুজনের দুটি ছবি দুরকম। কিন্তু যেটা ঐ ছবির মাধ্যমে ফুটে উঠছে, তা হল মুল কবিদের প্রতি অনুবাদক তথা সমগ্র বইটিরই একটা সম্ভ্রমের চিত্র। ফুটে ওঠে মৃত্যুর পরপারে পৌঁছে যাওয়া এই দুই জীবন বিলাসীর প্রতি অনুবাদকের সমসময়ের শ্রদ্ধা। পূর্ণেন্দুর নিজের লেখা কবিতার বই 'রক্তিম বিষয়ে আলোচনা'-র প্রচ্ছদটিও কমপ্যাক্ট প্রচ্ছদের আরেকটি ভালো উদাহরণ। লালরঙের ব্যাকগ্রাউণ্ডের ওপর সাদা তুলির টানে বিস্মিত, শঙ্কিত, ঝড়ের মতো এক যুবকের আর্তনাদময় রেখাচিত্র আঁকা হয়েছে মোট প্রচ্ছদপত্রের দুই তৃতীয়াংশের কিছু বেশী জুড়ে। তারপর তার চুলের ঠিক ওপরেই কালো কালি দিয়ে লেখা বইটির নাম ও তার একটু ওপরে শাদা দিয়ে লেখা পূর্ণেন্দুর স্বাক্ষর। গ্রন্থনামে কালো কালির ব্যবহারটাই অলক্ষ্যে প্রচ্ছদটিকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে।

প্রসঙ্গত শঙ্খ ঘোষের 'আমন ধানের ছড়া' নামের কচি কাঁচাদের জন্য লেখা ছড়ার বই—এর পাতায় পাতায় খুশী ছড়িয়ে দিয়েছেন পূর্ণেন্দু ভেতরের পাতায় সাদা আর মেঘ-নীল রঙের এলোপাথারি ছবিগুলোদে দাদু-দিদা আর তাদের আহ্লাদে নাতনীর আনন্দময় মুহূর্তগুলো এমন একটা আবছায়াতে এঁকেছেন, যে তা কখনই লেখকের ব্যক্তিগত হয়ে থাকে নি, প্রত্যেক পাঠকের ব্যক্তিগত মুহূর্ত রূপান্তরিত হয়েছে। বইটিই রঙিন প্রচ্ছদেও সেই আনন্দেরই উদ্ভাস।

আর একটি দুটি বই-এর প্রচ্ছদের উল্লেখ করে আলোচনা শেষ করি। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'মহাস্থবির জাতক' বইটির প্রচ্ছদে লাল এবং সবুজের পটরেখা-আকীর্ণ জাতকের ছবিটির একদম বাইরের লাল রেখার ওপরে সবুজ গাছের মতো চালচিত্রের প্যাটার্নটা লক্ষ্য করুন। ছবিটার প্রাণনা ঐখানেই লুকিয়ে আছে। বই এবং লেখকের নামের হরফটিতে লক্ষ্য করুন,পূর্ণেন্দু কিভাবে পালি হরফের একটা ছাঁদ এনেছেন। যেমনটা সত্যজিৎ ফেলুদার অনেক প্রচ্ছদে বা কাঞ্চনজঙ্ঘা সিনেমার লোগো তে এনেছেন। আবার সন্তোষকুমার ঘোষের ' শেষ নমস্কার' বইটির প্যাটার্নে আঁকা লজ্জাবনতা নারীচিত্রটি উপন্যাসটির আবেগ ও ভালোবাসার দিকটিকে অসাধারণভাবে রূপায়িত করেছে। পূর্ণেন্দুর নিজের বই 'কলকাতা সংক্রান্ত' তে একটা ক্যামেরার রিলের নেগেটিভ সূর্যাস্তের কলকাতার প্রতীকী অট্টালিকাগুলির চলচ্চিত্র যেন ফুটিয়ে তুলেছেন পূর্ণেন্দু, যে সহজ গতিময়তা তার বইয়ের অন্দরমহলেতে রয়েছে। আবদুল জব্বার-এর 'বাংলার চালচিত্র' বইটির প্রচ্ছদে পূর্ণেন্দু বাংলার লৌকিক পটচিত্রের আদলে রঙীন, সরল কিন্তু লাবণ্যময় চালচিত্রাবলী এঁকেছেন।

—এরকম আরো অসংখ্য প্রচ্ছদ রয়েছে পূর্ণেন্দুর যার প্রত্যেকটিই আলাদা করে বিশ্লেষণের অবকাশ রাখে। কিন্তু স্থানাভাব এবং কালাভাব আমাদের পিছু ছাড়বে না। উপসংহারে দু-এক কথা বলে শেষ করব কিন্তু তার আগে বলে রাখা ভালো যে

'কথোপকথন' সিরিজ নিয়ে এই পত্রিকায় ভিন্ন প্রবন্ধ রচিত হচ্ছে বলে সম্পাদক আমাকে সে-বিষয়ে অনধিকার উচ্চবাচ্য করতে না করেছেন, তা নইলে 'কথোপকথন'-এর আলোচনা ছাড়া পূর্ণেন্দু সংক্রান্ত যে কোন আলোচনাই যে অসমাপ্ত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৫

পূর্ণেন্দু পত্রী বাংলা তথা ভারতবর্ষের প্রচ্ছদশিল্পে একটা কালোত্তীর্ণ নাম। বহুধাবিস্তৃত প্রতিভার অধিকারী এই মানুষটির শিল্পকর্মের বিচার করা আমার সাধ্যসীমার অতীত। আমি কেবল ওনার সৃষ্টি সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত মতামত যুক্তিপরম্পরার সাহায্যে তুলে ধরতে পারি যাতে সেই মতামতের নৈর্ব্যক্তিক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। খালেদ চৌধুরী সত্যজিৎ রায় এদের সঙ্গে একাসনে রয়েছেন প্রচ্ছদশিল্পী পূর্ণেন্দু এবং পরবর্তী গৌতম বা দেবব্রত ঘোষের প্রচ্ছদ শিল্পে, পূর্ণেন্দুর উত্তরাধিকার প্রতিফলিত। আমরা এই আলোচনায় পূর্ণেন্দুর সব শ্রেণীর সমস্ত প্রচ্ছদ নিয়ে আমাদের ভাবনা প্রকাশ করবার সুযোগ পাইনি। কিছু সংখ্যক প্রচ্ছদ আলোচনার মাধ্যমে পূর্ণেন্দুর প্রবণতা এবং সার্থকতাকে ধরবার চেষ্টা করেছি মাত্র।

আরো একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। দুটি প্রচ্ছদের তুলনামূলক আলোচনায় কখনোই তীব্র বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণ উত্থাপন করা সবসময় সম্ভব হয় না। ছবির দুনিয়াতে একের পরম্পরা অন্যের দ্বারা উত্তরবাহিত হয় এবং সুপ্রযুক্ত হয় এই সত্যটাকে মনে রেখেই দুটি প্রচ্ছদ বা প্যাটার্নের মধ্যে মিল খোঁজার চেষ্টা রয়েছে এই প্রবন্ধে।

আমরা আগেও বলেছি, প্রচ্ছদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো গুণ হল ঐ নির্দিষ্ট বইটির ভাববস্তুর চিত্ররূপ বা প্রবেশদ্বার স্বরূপ নান্দীমুখ হয়ে ওঠা। আলোচ্য প্রবন্ধে পূর্ণেন্দুর প্রচ্ছদচিত্রী সত্ত্বারই বিচার করা হয়েছে এই প্রেক্ষিত থেকে। পূর্ণেন্দুর প্রচ্ছদে আঁকা ছবিগুলির মাধ্যমে চিত্রকর পূর্ণেন্দুর ক্ষমতা ও সম্ভাবনার আলোচনা এই প্রবন্ধে করা হয় নি।

সবশেষে বলতে পারি, পূর্ণেন্দু কেবল প্রচ্ছদশিল্পী নয়, প্রচ্ছদের মাধ্যমে কবিতা-মানব হিসাবেই আমাদের কাছে পরিচিত। তাঁর প্রচ্ছদায়িত অনেক কবিতা বা গদ্যের বই-এর অস্তিত্ব ক্ষুণ্ণ হয়ে যেত ঐ প্রচ্ছদটি ছাড়া। যেমন 'হঠাৎ নীরার জন্য' বইটি অসম্পূর্ণ নীরার ঐ চিত্ররূপটি ছাড়া। সুতরাং কবিতা প্রয়াসী অনভিজ্ঞ যুবকের কাছে পূর্ণেন্দুর প্রচ্ছদতর্পন মানে এক একটা কবিতা তথা সাহিত্য অনুভূতির সম্পূর্ণায়ন মাত্র। কিন্তু কে না জানে কবিতার সম্পূর্ণায়ন কখোনোই সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে না। চলতেই থাকে। তাই এ প্রবন্ধও শেষ হয়ে হইল না শেষ...

ঋণস্বীকার
দে'জ পাবলিশিং
অনুষ্টুপ, শারদীয় ১৪১৪